হোমো স্যাপিয়েনস

RETELLING OUR STORY

রাফান আহমেদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

এক নজরে

মহাবিশ্বের বিস্ময়ে

নক্ষত্রের কোরাস ১২
ঝরনার কথা ১৭
মহাকাশে নৃত্য ২১
মহাবিস্ফোরণ এবং অতঃপর ২৪
বিনি সুতোর মালা ৩১

বিজ্ঞানের কথামালা

বিজ্ঞানের গান ৩৮
ল্যাবরেটরির অন্তঃপুর ৪৫

বিবর্তনের জানা-অজানা

বিবর্তনের ইতিবৃত্ত ৫৪
বিবর্তনচিন্তার কাঠামো ৬৩
বুদবুদ রহস্য ৭৫
প্রাণের গান ৮২
হেকেলের হাতসাফাই ৯২
পাথরের মাঝে ৯৬
আর্কিওপটেরিক্স ১০০
আধুনিক ঘোড়ার বিবর্তন ১০৩

কঙ্কালের কান্না ১০৫
দি মিথ অফ ১% ১১৩
রয়েছ নয়নে নয়নে ১১৮
এপেন্ডিক্স সরগরম ১২৫

এক চিলতে ভবিষ্যতে

দি ডিসেপশন পয়েন্ট ১৩৪

এই তো শেষ

সংযুক্তি ১ ১৪২
সংযুক্তি ২ ১৪৬
তথ্যসূত্র ১৪৯
অভিমত ১৭৫

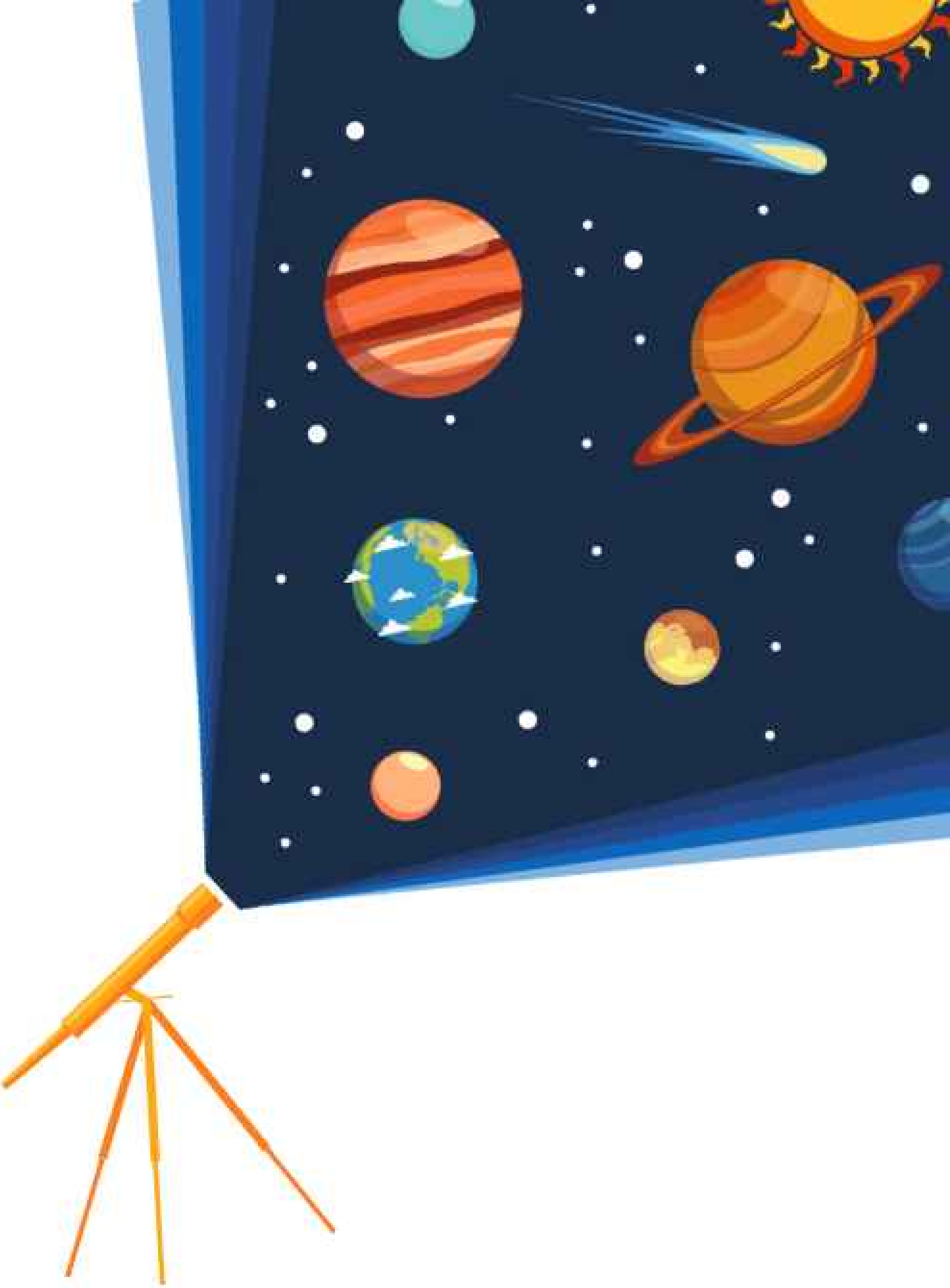

নক্ষত্রের কোরাস

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
~ Jane Tylor

সন্ধ্যা-সময়ে হাঁটতে বের হলাম। ঝিরিঝিরি হাওয়া চারপাশে গুনগুন করে বয়ে চলছে; আলতো করে কপোলকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। আকাশের লালিমা এখনও মিটে যায়নি। ছেয়ে-যাওয়া আঁধারের সাথে লাল রঙ মিশে এক অদ্ভুত আবেশের আসর বসিয়েছে। সকালে যদিও একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু আকাশ এখন হেমন্তের মতো পরিষ্কার। মেঘের লেশমাত্র নেই। হঠাৎ তালে-থাকা ঝোপের দিকে চোখ আটকে গেল। কী যেন জ্বলে উঠল না? ভুল দেখলাম নাকি? নাহ! ওই তো, আবার জ্বলে উঠল! আরে, জোনাকি দেখি! অনেক দিন পর জোনাকি দেখলাম। ছেলেবেলার সেই কবিতার কথা মনে পড়ে গেল :

তারা একটি দুটি তিনটি করে এল
তখন— বৃষ্টি-ভেজা শীতের হাওয়া
বইছে এলোমেলো,
তারা— একটি দু'টি তিনটি করে এল।

...

আলোর পাখি নাম জোনাকি
জাগি রাতের বেলা,
নিজকে জ্বেলে এই আমাদের
ভালোবাসার খেলা।
তারা নইকো- নইকো তারা
নই আকাশের চাঁদ
ছোট্ট বুকে আছে শুধুই
ভালোবাসার সাধ। [জোনাকি, আহসান হাবিব]

হাঁটিতে হাঁটিতে আবার আকাশের দিকে চোখ পড়ল। আকাশের বুকেও অনেক জোনাকি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ওদের একটা গালভরা নাম আছে জানো? নক্ষত্র (stars)। খটমটে না নামটা? আচ্ছা সহজ নাম বলি—তারা। আমরা-তোমরা-তাঁরা না কিন্তু, ওরা হলো আকাশের তারা। আকাশের বুকে ঝলসানো রুটির মতো গোলগাল চাঁদ আর ঝিকিমিকি রুপার ফুলের মতো তারা নিয়ে কত-যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

রাতের নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন পথে যাব?
'তোমারই নিজের ঘরে চলে যাও '— বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে —
'অথবা ঘাসের 'পরে শুয়ে থাকো
আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে

[নিরালোক, জীবনানন্দ দাশ]

আকাশের ক্যানভাসে ওদের নিত্য খেলা দেখে অবাক হয়নি, ভাবুক হয়নি এমন একজনকেও বোধ করি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একজনও বোধ করি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে একবার হলেও অবাক হয়ে ভাবেনি—এগুলো কী? কীভাবে অস্তিত্বে এল? কে তৈরি করল এই মহাযজ্ঞ?

জমকালো আকাশে আলোর-আধার হয়ে হাস্যোজ্জ্বল শুভ্রপথ, ইংরেজিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। আকাশ পুরোপুরি জমকালো অমানিশায় ঘেরা না হলে শুভ্রপথ দেখতে পাওয়া যায় না। গবেষকরা বেশকিছু জায়গা খুঁজে বের করেছেন যেখান থেকে ছায়াপথ দেখা সহজ হয়। (ছবিসূত্র : পিক্সাবে)

মেঘহীন ঘুটঘুটে রাতের আকাশে চেয়ে থাকলে এক মাথা থেকে অপর মাথায় অসংখ্য নক্ষত্রকে সাদা কুয়াশার চাদরের মতো বিস্তৃত থাকতে দেখা যায়। নক্ষত্রের এমন একেকটা পরিবারকে বলা হয় ছায়াপথ; আরেকটা সুন্দর নাম হলো নক্ষত্রবীথি। আমাদের ছায়াপথের একটা সুন্দর নাম আছে—মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি (Milky way galaxy)। আমি নাম দিয়েছি শুভ্রপথ, যদিও কে জানি আগেই নাম দিয়ে রেখেছে আকাশগঙ্গা।

ধুত্তোরি, এমন খটমটে নাম দিল কেন?

যাই হোক, আমাদের ছায়াপথই কিন্তু একমাত্র নয়। মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, মহাবিশ্বে বিশালাকার এসব নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা ২০,০০০ কোটিরও বেশি! (লিভসে ক্লক, ২০১৭)[১] কল্পনা করা যায়, কী প্রকাণ্ড এই মহাবিশ্ব! শুনে মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছে? আরে দাঁড়াও না, গল্প তো শুরু হচ্ছে কেবল।

এই ছায়াপথগুলো কী দিয়ে গঠিত, জানো? গাদা-গাদা নক্ষত্র, মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাস মিলেমিশে একেকটা ছায়াপথে পরিণত হয়েছে। গাদা-গাদা মানে কিন্তু অনেক, অনে.........ক! কেবল আমাদের ছায়াপথের তারার সংখ্যা শুনলে ভিমড়ি খেয়ে যাবে—আনুমানিক প্রায় ৩০ হাজার কোটি! সূর্য এদের মাঝে কেবল একটি! অনুমান করা হয় গড়পরতায় প্রতিটি ছায়াপথে অন্তত ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। তা হলে মোট নক্ষত্রের সংখ্যা কত দাঁড়াল? সোজাকথা—গণনার বাইরে। বর্তমান ধারণা অনুযায়ী এসব নক্ষত্রের মাত্র দশ শতাংশকে ঘিরে গ্রহপুঞ্জ (Planets) আবর্তিত হয়। গ্রহকে ঘিরে ঘুরতে থাকে উপগ্রহ (Satellites) বা চাঁদ। এদের নিয়েই তৈরি হয় একেকটা সোলার সিস্টেম।

ছায়াপথে আরও ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য গ্রহাণু (Asteroids); এদের কেউ কেউ কোনো গ্রহের চারিদিকে দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়; কেউ-বা উদ্‌বাস্তু হয়ে ধূমকেতু-তে রূপ নেয় (Comets)। ছায়াপথে আরও দেখতে পাওয়া যায় নানারঙা নীহারিকা (Nebula)। সাহিত্যের ভাষায় বললে, নীহারিকা হলো মহাশূন্যের বিপুল-ক্যানভাসে-আঁকা বর্ণিল মনোমুগ্ধকর মেঘমালা। ধূলিকণা, হাইড্রোজেন ও প্লাজমা দ্বারা গঠিত প্রকাণ্ড দানবাকৃতির

হেলিক্স নেবুলার মডেল (ছবি: নাসা)

আন্তঃনাক্ষত্রিক-মেঘ হলো এই নীহারিকা। এখানে নক্ষত্রদের জন্ম হয় বলে মনে করা হয়। আমাদের সবচেয়ে কাছের নেবুলাটির নাম হলো হেলিক্স নেবুলা।

ছায়াপথে-থাকা-নক্ষত্ররাজি, গ্রহ ইত্যাদির মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে মহাকাশ বা মহাশূন্য বলা হয়। পাঠ্যবইয়ের ভাষায়, 'মহাবিশ্বের অনেককিছুই মহাকাশ-নামক সীমাহীন ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।' (বিজ্ঞান। অষ্টম শ্রেণি, ২০১৯)[২] তবে মহাকাশ একেবারে ফাঁকা জায়গা, এতে পদার্থ অনুপস্থিত—এমন বলা ঠিক না। কারণ মহাকাশ জুড়ে থাকে মহাজাগতিক ধূলিকণা, গ্যাস, তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ, চৌম্বক ক্ষেত্র, নিউট্রিনো, প্লাজমা ইত্যাদির মহাসমারোহ! (এলিজাবেথ হাওয়েল, ২০১৭)[৩]

কোনো এক হেমন্ত বা শীতের ঘুরঘুট্টি আঁধার রাতে, আকাশের পানে তাকিয়ে তুমি এই নক্ষত্রবীথির সাথে মিতালি করতে পারো। ভাগ্য ভালো থাকলে এক প্রতিবেশীর সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে। এটি হলো আমাদের সবচেয়ে কাছের ছায়াপথ অ্যান্ড্রোমিডা। সূর্যেরও এমন একটা প্রতিবেশী আছে—লাল বামন নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরি; এদের যদিও খালি চোখে দেখতে পাবে না। আব্বুকে বলে কোনোমতে যদি একটা টেলিস্কোপ জোগাড় করে ফেলতে পারো তা হলে হয়তো ছায়াপথের দেখা মিলবে। জ্যোৎস্না-ভেজা-রাতে চাঁদের কালো দাগও দেখতে পারবে। রুপালি জোছনার আবেশে দু-চার চরণ কবিতাও হয়তো লিখে ফেলতে পারো।

ঘর খুলিয়া বাহির হইয়া
জোছনা ধরতে যাই
হাত ভর্তি চান্দের আলো
ধরতে গেলে নাই।
[অবাক জোছনা, হুমায়ূন আহমেদ]

যখন তুমি চিন্তা করতে শিখে যাবে তখন বুঝতে পারবে, মহাবিশ্বে আমাদের স্থান কতটা নগণ্য! আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের বিশালতার মাঝে সূর্যকে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর; পৃথিবীর কথা তো আগেই বাদ। স্পেস প্রোব ভয়েজার-১ আমাদের ছায়াপথের মধ্যে থেকেই পৃথিবীর যে ছবি পাঠিয়েছে তাতে পৃথিবীকে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। সর্বসাকুল্যে আসমানি বর্ণের একেবারে মলিন একটা বিন্দু দেখতে পাওয়া যায়, একটা Pale blue dot!

এই বিশাল মহাবিশ্বে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝে প্রায় এক অস্তিত্বহীন বিন্দুতে আমাদের বসবাস। কত তুচ্ছ, কত নগণ্য! তারপরও আমাদের কত অহংকার, কত গর্ব তাই না? একটু ভেবে দেখো না! মহাজাগতিক সমুদ্রের মাঝে আমাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না। অথচ আমরা অর্থ-ক্ষমতা-জ্ঞান-গায়ের রঙ-বংশ-গোত্র-ভাষা-দেশ-জাতি নিয়ে গর্ব করে বেড়াই। এই গর্বপ্রসূত অন্যায়-অত্যাচার-হত্যাকাণ্ডে মানব-ইতিহাসের পাতা থেকে চুইয়ে পড়ছে রুধির! ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে—মানব-ইতিহাসে সংঘটিত

ভয়েজার-১ থেকে পাঠানো ছবি। এর মাঝে কোনো এক জায়গায় পৃথিবী আছে। দেখো তো খুঁজে পাও কি না। (ছবি : নাসা)

যুদ্ধের প্রায় ৯৩ শতাংশই হয়েছে জাগতিক স্বার্থের কারণে; ক্ষমতা, আধিপত্য, সম্পদ, ভূমির লোভে! (ব্রুস শেইম্যান, ২০০৯)[২]

অথচ মনে হয়, বিস্তৃত মহাজগতের আচ্ছন্নকারী আঁধারের মাঝে আমরা এক বিন্দু ছাড়া কিছুই না।

কী, মন খারাপ হয়ে গেল? মন খারাপ করে দেওয়ার জন্য বলিনি, স্রেফ নিজের অবস্থানকে বোঝানোর জন্যই বলা। আমরা চাইলে, মহাবিশ্বের এই ব্যাপ্তি থেকে অহংকার না করার শিক্ষা নিতে পারি। আচ্ছা দাঁড়াও, একটা রহস্যের কথা তোমাদের বলিনি। আপাতদৃষ্টিতে এক নগণ্য বিন্দু মনে হলেও আমরা কিন্তু একমাত্র ও অভাবনীয়। আমরা বলতে বোঝাচ্ছি এই মহাবিশ্ব ও প্রাণ। সকল প্রাণ; এককোষী থেকে বহুকোষী, এমিবা থেকে মানুষ। কেন বললাম জানো?

চলো তা হলে, ধীরে ধীরে রহস্যের খোঁজে যাওয়া যাক।

ঝরনার কথা

Read, in the Name of your Lord

~ Holy Qurán, 96 : 1

আদিকাল থেকেই মানুষ আকাশ-পানে তাকিয়ে একে বুঝতে চেয়েছে। জগৎ বুঝতে চাওয়ার প্রচেষ্টায় নানা-ভাবনা, নানা-চিন্তা কালে-কালে আবির্ভূত হয়েছে। গ্রিকরা একরকম ভাবত। কালের আবর্তে সে ভাবনা বদলে গেছে। গ্রিক চিন্তাবিদগণ মূলত থিওরিস্ট ছিলেন—স্বীয় অনুমান-অনুধাবন কাজে লাগিয়ে কিছু ধারণা প্রকাশ করতেন। কিন্তু সেগুলোকে গবেষণা/পরীক্ষালব্ধ কোনো উপায়ে উপস্থাপনের উপায় জানা ছিল না কারও। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানযাত্রার সূচনা ঘটে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ স্মৃতিচারণ করেন (অ্যাডাম স্মিথ, ১৮৬৯)[১] :

> **সর্বপ্রথম খলিফাদের সাম্রাজ্যেই পৃথিবীর মানুষ এক প্রশান্তি আস্বাদন করেছিল, যা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।... তাদের কোমল, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মীয় শাসকবর্গ সেই প্রশান্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল বিস্তৃত সাম্রাজ্যে। যা-কিনা প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক জানার ব্যাপারে মানুষের কৌতূহলকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল ...**

৮ম-১৪শ শতকের মাঝে মুসলিম-সাম্রাজ্যে ঘটে-যায় এক অভূতপূর্ব জ্ঞানবিপ্লব। অনেকেই এই সময়কালকে গোল্ডেন এইজ অব ইসলামিক সাইন্স বলে অভিহিত করেন। এই কয়েক শতাব্দীতে মুসলিমরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং উন্নতি লাভ করেছিল, মানব-ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোনো নজির পাওয়া যায় না। মরুভূমির শুষ্ক ও তপ্ত বালুতে জেগে ওঠে, সুদূর স্পেন থেকে নিয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিকশিত হওয়ায় ইসলামি সভ্যতা তখন অসংখ্য বৈচিত্রময় সংস্কৃতি, ধর্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের ধারকে পরিণত হয়। পূর্ববর্তী সভ্য ০১৭৫৬০৫৫৭৮৬ তার অবদানগুলোকে একত্রিত ও সমন্বিত করে বিজ্ঞানচর্চার এক নব-দিগন্তের সূচনা হয়। মুসলিম-সাম্রাজ্য তখন নানা চিন্তার, নানা বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য জ্ঞানী মানুষের এক মিলনমেলায় রূপ নেয়। (ক্বিরান আল-খাতিব, ২০১৭)[২]

ইতিহাসের পাতা খুলে জানা যায়, এই অভূতপূর্ব জ্ঞানবিপ্লবের পিছনে ঐশী বাণীর প্রেরণা ছিল। ঐশী জীবনবিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞানার্জন ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হতো। আরব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আসমানি বাণীতে সেই অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন। (জোনাথন লিয়নস, ২০১০)[৩] ঐশী বাণী থেকে পাওয়া

অনুপ্রেরণা বুকে ধারণ করে ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান আহরণে চঞ্চল মধুকরের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকেন জ্ঞানপিপাসু মানুষেরা। ধর্মীয় প্রয়োজনে, নতুন কিছু পাওয়ার নেশায় তারা একে একে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পদচিহ্ন রাখা শুরু করেন। আধুনিক বর্ণমালার ভিত্তি যে আরবি কুফী বর্ণমালা তা আবিষ্কৃত হয়েছিল ফোরাত নদীর তীরে। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কারণে কাগজ বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। রেশম পোকার মথ ব্যবহার করে চীনাদের কাগজ তৈরির পদ্ধতি মুসলিমরা গ্রহণ করে এবং তাতে আরও উন্নতি ঘটায়। ফলে উন্নত কাগজশিল্প গড়ে ওঠে। যাকাত-ফিতরা প্রভৃতির হিসেব-নিকেশের তাগিদে গণনা-পদ্ধতি উন্নতি লাভ করে। আরবি সংখ্যার ব্যবহার, গণিতে জাগরণ ঘটানো সংখ্যা 'শূন্য'-র ব্যবহারিক প্রচলন, বীজগণিতকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে রূপ দেওয়া, অ্যালগরিদম আবিষ্কার—এ সবই ঘটে-চলে ইসলামি-সাম্রাজ্যের পণ্ডিতদের হাত ধরে। পশ্চিমে আরবি সংখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে দ্বাদশ শতকে, 'শূন্য'হীন বড়ো বড়ো সংখ্যা লেখার ঝামেলাপূর্ণ রোমান পদ্ধতির জায়গা দখল করে নেয় সোজাসাপ্টা আরবি সংখ্যামালা।

ইসলামে প্রতিমা, প্রতিকৃতি তৈরি নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন বহু মুসলিম শিল্পী তাদের শৈল্পিক দক্ষতার স্ফুরণ ঘটিয়েছে—পাথর, তাঁত ও কাঠের উপর জ্যামিতিক নকশায়; এরাবেস্ক-নামক অভিনব শিল্পের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির অঙ্গন মুসলিমদের অবদানে সমৃদ্ধ। সাইন আর কোসাইন টেবিল তৈরি হয়েছে, কিউবিক সমীকরণ সংজ্ঞায়িত হয়েছে, দ্বিঘাত সমীকরণের রুট বা মূলসংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণধর্মী ও সাধারণ ত্রিকোণমিতি প্রসার লাভ করেছে এবং জ্যামিতিক জ্ঞান উন্নত হয়েছে। ধাতুবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জৈব ও অজৈব রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের বেশ অগ্রগতি ঘটে সে সময়। প্রযুক্তিগত

সালাতের সময় ও দিক নির্ণয়ের তাগিদে মুসলিম বিজ্ঞানী আল ফারাযি'র তৈরি করা অ্যাস্ট্রোল্যাব। জ্যোতির্বিদ হ্যারল্ড উইলিয়ামস-এর মতে কম্পিউটার ও টেলিস্কোপ আবিষ্কারের আগে অ্যাসট্রোল্যাব ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণনাযন্ত্রের একটি। (ছবি: ১০০১ ইনভেনশনস)

উন্নতি সাধিত হয় এক্সেল, লিভার, পুলি, উইন্ডমিল প্রভৃতি যন্ত্রের এবং বেশ কিছু পদ্ধতির যেমন : ক্যালসিনেশান, বিজারণ, পাতন, স্ফটিকীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি। অভিকর্ষ তত্ত্ব ও বায়ুর স্থিতিস্থাপক তত্ত্ব-সহ আরও অনেক তত্ত্বের উন্নতি ঘটে। চিকিৎসাশাস্ত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। গড়ে ওঠে প্রথম হাসপাতাল, আবিষ্কৃত হয় নতুন-নতুন পথ্য ও শল্যচিকিৎসার নানা যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি। (ডা. লরেন্স ব্রাউন, ২০১১)[৫]

এই মুসলিম পণ্ডিতগণই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ছক গড়ে তুলতে মূল ভূমিকা পালন করেন। আজকের বিজ্ঞানে যে *পিয়ার রিভিউ* পদ্ধতি বহুল প্রচলিত, তা সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন ইসহাক ইবনু আলি রাহাউই। (জ্যাকলিন কেলি এট আল., ২০১৪)[৬] প্রথম যিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোনো ধারণা যাচাই-বাছাইয়ের ছক আঁকেন, তিনি ছিলেন অপটিক্স-এর জনক হাসান ইবন আল-হাইসাম (৯৬৫-১০৪০ খ্রি.), একজন মুসলিম পণ্ডিত। বর্তমানে তাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। (জিম আল খলিলি, ২০০৯, ২০১২)[৭] বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রূপরেখা আঁকার পিছে যে বাসনা তার চালিকাশক্তি হিসেবে ছিল তা হলো, স্রষ্টার নৈকট্য হাসিল করা। (আলিয়াস ও হানাপি, ২০১৫)[৮] তাঁর ভাষায় (ফিরাস আল-খাতিব, ২০১৭)[৯]:

> **আমি সর্বদাই জ্ঞান ও সত্যের খোঁজে উৎসুক থাকি। আমার মনে হয়—ঐশী দ্যুতির খোঁজ পেতে ও স্রষ্টার নৈকট্য হাসিলের জন্য সত্য ও জ্ঞান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়াই সবচেয়ে উত্তম উপায়।**

পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা তাঁর থেকে গ্রহণ করেন ইউরোপের পণ্ডিত রজার বেকন। কিন্তু বড়ো আফসোসের ব্যাপার হলো, বেকন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রস্তাবনার কোনো কৃতিত্ব হাসান ইবন আল-হাইসামকে দেননি; দিয়েছেন পিটার পেরেগ্রিনাস নামের এক ফরাসি পণ্ডিতকে—যে কিনা ক্রুসেডারদের একজন ছিল! কেন? এক গবেষকের পর্যবেক্ষণে জানা যায় (ব্রাডলি স্টিফেনস, ২০০৬)[১০]:

> **বেকন পেরেগ্রিনাসকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং তার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। সে কারণেই হয়তো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক হিসেবে ইবন আল-হাইসামের বদলে তিনি পেরেগ্রিনাসকে বেছে নিয়েছিলেন। আরেকটি কারণ হতে পারে—মুসলিম ও খ্রিস্টানরা যখন জেরুজালেম ও সংলগ্ন এলাকার কর্তৃত্ব দখল নিয়ে ক্রুসেড যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সে-সময় বেকন ও পেরেগ্রিনাস উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানদের দলে। বেকন ছিলেন পাদরিদের কাতারে, আর পেরেগ্রিনাস তো এক ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অংশই নিয়েছিলেন। এসকল সংঘাতের প্রেক্ষিতে বেকন হয়তো ভেবেছিলেন—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে মুসলিম পণ্ডিতের নাম জুড়ে দিলে খ্রিস্টান সমাজে এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা মন্থর হয়ে পড়বে।**

তোমাদের পাঠ্যবইতে এসব কথা পাবে না! কয়েকবছর আগ পর্যন্তও রজার বেকনকেই 'পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবক্তা' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদের পাঠ্যবইতে! (পদার্থবিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৭)[১০] যে মুসলিমদের হাত ধরে আজকের বিজ্ঞানের সূচনামশাল জ্বলে উঠল, সেই আলো অন্যরা সুকৌশলে সরিয়ে নিয়ে গেল। মানুষকে জানতে দেওয়া হলো না যে, মুসলিম সভ্যতার অবদানের কারণেই একসময় অন্ধকার ইউরোপে আসে নবজাগরণ বা রেনেসাঁ! (রবার্ট ব্রিফল্ট, ১৯০৯)[১১]

> **পঞ্চাদশ শতক নয় বরং মরুবাসী ও স্পেনের অধিবাসী আরবদের দ্বারাই সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের প্রভাবে প্রকৃত রেনেসাঁ সংঘটিত হয়েছিল। ইটালি নয়, বরং মুসলিম স্পেনই ছিল ইউরোপের নবজাগরণের জন্মস্থান-স্বরূপ।**

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদানের পাশাপাশি জ্যোতির্বিদ্যাতেও অগ্রগতি ঘটা শুরু হয়। পৃথিবীর যে বর্তুলাকার, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিলেন। (ইসলাম কিউএ, ২০১৪)[১২] মক্কায় অবস্থিত কা'বার দিকে সালাত আদায়ের আদেশ বাস্তবায়নের তাগিদে সঠিক দিক-নির্ধারণ-পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়; ফলে ভৌগলিক নকশা, চুম্বক-কম্পাস, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ হিসেব, নক্ষত্রের নকশা, উন্নত অ্যাস্ট্রোল্যাব-সহ নানা জিনিস আবিষ্কৃত হয়; গড়ে ওঠে মানমন্দির (observatory)। সে সময় মুসলিমরা এমন উন্নত কিছু ভৌগলিক নকশা তৈরিতে সক্ষম হয়, যা কয়েক শতাব্দী ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। (সালিম হাসানি, ২০১২)[১৩]

তাদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোত একসময় ইউরোপের দিকে ধাবিত হয়। আরব বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বইপত্র আরবি থেকে ল্যাটিনে অনুবাদের মাধ্যমে পশ্চিমা পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। মুসলিম-বিজ্ঞানীদের নামগুলোও ল্যাটিনে লেখা হতে থাকে; তাদের আবিষ্কার যারা ইউরোপে নিয়ে আসে সেসব ইউরোপীয়কে মূল আবিষ্কারক বানিয়ে দেয়া শুরু হয়। রবার্ট ব্রিফল্ট জানান (রবার্ট ব্রিফল্ট, ১৯০৯)[১৪]:

> **অন্যান্য আরব আবিষ্কারের মতই আরব থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রথম যে ইউরোপীয় ব্যক্তি নিয়ে আসলো সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল আবিষ্কারক হয়ে গেল। একইভাবে কম্পাসের আবিষ্কারক হলেন ফ্লাভিও জোইয়া, অ্যালকোহলের আর্নল্ড অফ ভিলনোভ, লেন্স ও বারুদের বেকন বা শোয়ার্টজ। ইউরোপীয় সভ্যতার উৎস নিয়ে অত্যন্ত গুরুতর ভুলধারণা এভাবেই ছড়িয়েছে।**

ফলে তাদের মুসলিম পরিচয় কালির আঁচড়ে হারিয়ে যায়!

মহাকাশে নৃত্য

We all live under the same sky, but
we don't all have the same horizon
~ *Konrad Adenauer*

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি মহাকাশ নিয়ে আরবদের নানা ভাবনা পশ্চিমে এসে অগ্রসর হতে থাকে। বিভিন্ন চিন্তাবিদদের হাত ধরে পর্যায়ক্রমে ভাবনাগুলো গাণিতিক রূপ পেতে থাকে। বিজ্ঞানের সূচনাকাল ও বিকাশের সময় ঘেঁটে দেখা যায়, এ-সকল গবেষক স্রষ্টার বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন পরম স্রষ্টা জগতে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন; জগতের শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দেখে তাই প্রকৃতি সম্পর্কে জানার পিপাসা তাদের অগ্রগামী করে দেয়। তাঁরা আরও অবাক হয়েছেন এটা দেখে যে—জগতকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। মহাকাশবিদ্যাকে ইংরেজিতে কসমোলজি (cosmology) বলা হয়। এটি যে গ্রিক (κοσμος) শব্দ-থেকে-আসা তার অর্থের মাঝে রয়েছে—শৃঙ্খলা, নিয়মানুগ আচরণ, সৌন্দর্য ইত্যাদি। পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান অবাক হয়ে বলেছিলেন, '*প্রকৃতির সূত্রবদ্ধরূপ আমার কাছে অলৌকিক মনে হয়... এই সূত্রগুলো গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায়... এ ব্যাপারটা এক রহস্য...।*' মহাবিশ্ব যে যৌক্তিক ও সুশৃঙ্খল—এমন মনোভাবের উপর বিজ্ঞান খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতিতে সুসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান, বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি পরিচালনার জন্য এই ধারণা আবশ্যক।

> স্রষ্টা হলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের গণিতজ্ঞ। মহাবিশ্বের বুননে তিনি অতি উচ্চস্তরের গণিত ব্যবহার করেছেন।[১]
>
> – পল এম. ডিরাক
> তাত্ত্বিক পদার্থবিদ

আইজ্যাক নিউটনের নাম তো তোমরা সবাই শুনেছ। মহাকর্ষ সূত্র প্রস্তাবনার জন্য তিনি বিখ্যাত। নিউটন ছিলেন একজন একত্ববাদী (unitarian) খ্রিস্টান। বাইবেলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এতে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। যিশুকে ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে খোদার আসনে বসানো হয়েছে; ত্রিত্ববাদের ধারণা পরবর্তী সময়ের আবিষ্কার। তাই তিনি সে ভ্রান্ত ধারণা বর্জন করে একত্ববাদকে বেছে নেন। (স্টিভেন জোনস, ২০১১)[২] জগতের নিয়মবদ্ধ আচরণ দেখে নিউটন আপ্লুত হতেন। স্রষ্টার নির্ধারণ করা সেই নিয়মের খোঁজে তিনি চিন্তাভাবনা করতে থাকেন এবং কিছু ব্যাখ্যা

দাঁড় করান। তোমরা গল্প শুনেছ : আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় নিউটনের মাথায় টুস করে আপেল পড়ে। আমি-তুমি হলে হয়তো আপেলটা মুছে খেয়ে ফেলতাম। কিন্তু নিউটন খাওয়া বাদ দিয়ে—আপেল নিচেই পড়ল কেন—এই চিন্তা করতে-করতে একসময় তার মাথায় মহাকর্ষের সূত্র চলে আসে। গল্পটা যদিও ঠিক না। আর মহাকর্ষও এত সোজা কিছু না। বহু বছর কেটে গেছে বিজ্ঞানীরা এখনও মহাকর্ষের প্রকৃত রূপ ঠাহর করে উঠতে পারেননি! (অ্যামান্ডা গ্যাফটার, ২০১০)[৩] আমাদের চেনা সূর্য, চাঁদ, গ্রহ ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুর বিচলন ব্যাখ্যা করার জন্য বহু বছর আইজ্যাক নিউটনের প্রস্তাবিত মহাকর্ষ সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তোমরা পদার্থবিদ্যার বইতে এর গাণিতিক রূপ দেখেছ :

> সূর্য, গ্রহ ও ধূমকেতুর এই মনকাড়া সজ্জা শুধুমাত্র এক মহাবুদ্ধিমান ও শক্তিশালী সত্তার কর্তৃত্ব ও ইচ্ছা থেকেই পরিচালিত হতে পারে।
>
> - আইজ্যাক নিউটন

$$F = Gm_1m_2/r^2$$

প্রায় ২৫০ বছর ধরে মহাজাগতিক বস্তুর গতিবিধি বর্ণনা ও গণনা করার জন্য নিউটনের সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূত্রের মূলনীতি ব্যবহার করে মানুষ চাঁদ থেকে ঘুরে এসেছে। তবে একসময় দেখা গেল, প্রস্তাবিত ব্যাখ্যার সাথে কিছু পর্যবেক্ষণ মিলছে না। (ইথান শিগেল, ২০১৬)[৪] বুধগ্রহের গতি হিসেব-নিকেশ করে দেখা গেল, নিউটনের তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে তা বেমানান। বিজ্ঞানীরা অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তোমরা তো শুনেছ, গ্রহগুলো যার যার কক্ষপথে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এই কক্ষপথগুলো স্থির, অপরিবর্তনশীল মনে করা হয়। কিন্তু বুধ গ্রহের ব্যাপারটা একটু আলাদা। দেখা গেল, এর কক্ষপথ খানিকটা দোল খায়। (আহমেদ মোস্তফা কামাল, ২০১৯)[৫]

জগতের নিয়মকে বোঝার চেষ্টায় নতুন পদক্ষেপ নিয়ে আসলেন আরেক দিকপাল—আলবার্ট আইনস্টাইন। জগতের নিয়মবদ্ধতা দেখে আইনস্টাইনও বিমোহিত হতেন। জগতকে যে মানুষ বুঝতে পারে—এ ব্যাপারটা তাকে মোহিত করে রাখত। সেই শৃঙ্খলার খোঁজে তিনি ভিন্ন পথে যাত্রা করেন। বিংশ শতকের শুরুতে এসে নিউটনের বক্তব্যের ভিতটাই নাড়িয়ে দিলেন! বদলে দিলেন স্থান-কাল-মহাকর্ষের প্রচলিত ধারণা। তিনি প্রস্তাব করলেন, অতিভরবিশিষ্ট বস্তুর উপস্থিতির কারণে স্থান-কাল বেঁকে যায়। স্থান-কালের এই বক্রতাই (space-time curvature) মহাকর্ষের মূল কারণ। কিছু অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে তিনি জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রস্তাব করেন।

> এই মহাবিশ্বে সুশৃঙ্খলার ছাপ অবাক করার মতো। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা যতই আবিষ্কার করি ততই খুঁজে পাই যে এটি যৌক্তিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কেউ চাইলে বলতেই পারে যে, এই সুশৃঙ্খলতা স্রষ্টার কাজ। আইনস্টাইনও তাই ভেবেছিলেন।[৬]
>
> - স্টিফেন হকিং
> তাত্ত্বিক পদার্থবিদ

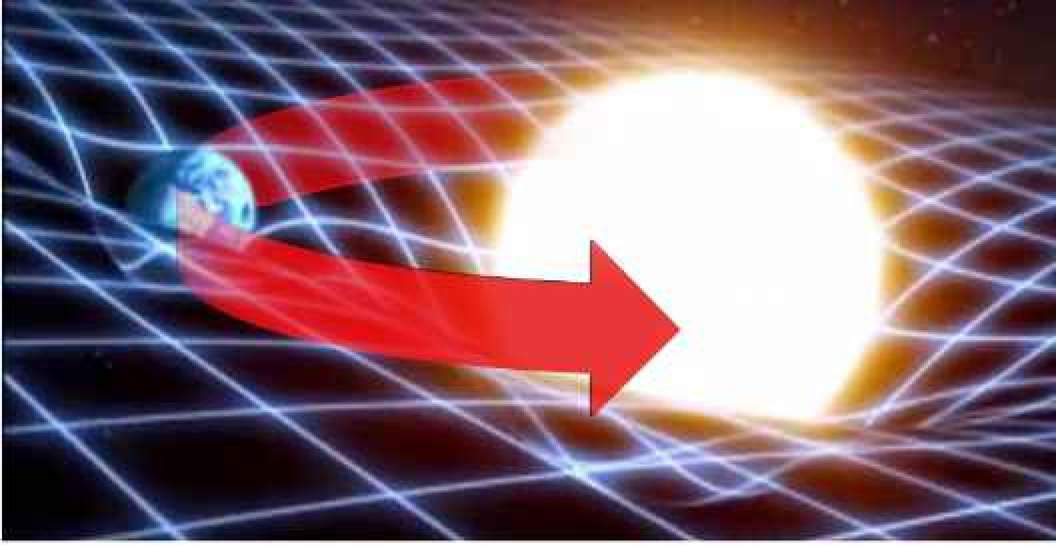

$$R_{ab} - 1/2\, R\, g_{ab} + \Lambda\, g_{ab} = k\, T_{ab}$$

নিউটনের আকর্ষণ ধারণা বাদ দিয়ে, মহাকর্ষের নতুন ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেন আইনস্টাইন। মজা করে বললে, নতুন এই ধারণা হল ঠেলাঠেলির ধারণা। স্থান-কালের চাদরে ভরের ঢেউ। ছবির নিচে আছে আইনস্টাইন ফিল্ড ইকুয়েশন।

তারপর থেকে গ্রহ, নক্ষত্র-সহ বিশ্বলোকের এই প্রকাণ্ড আকারের গ্যালাক্সিগুলোর গতিবিধি ব্যাখ্যার জন্য এই সূত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। আইনস্টাইন একেবারে প্রথমে যখন এই সূত্রের ছক কাটলেন, তখন এমন কিছু সামনে এল যার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, সময়ের সাপেক্ষে অপরিবর্তনশীল ও স্থির কোনো মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার মতো কোনো সমাধান তাঁর সমীকরণে নেই। বরং সূত্র থেকে এমন সম্ভাবনা দেখা গেল যে, বিশ্বজগৎ প্রসারিত হতে পারে! অথচ আইনস্টাইন-সহ সেকালের অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস ছিল এক চিরস্থায়ী মহাবিশ্বে। তারা মনে করতেন মহাবিশ্ব স্থির ও সীমাহীন; এর শুরু—শেষ নেই (Static infinite universe)! তাই আইনস্টাইন কোনোভাবেই এই প্রসারণের ব্যাপারটি মানতে পারলেন না। মহাকর্ষ বল তো দুটি বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখবে, তা হলে প্রসারণ কীভাবে হয়? মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই নিজে-নিজে প্রসারিত হতে পারে না।

তাই মহাকর্ষের টানে সব গ্যালাক্সি যেন এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে না যায় সেজন্যে তিনি তার সূত্রের মাঝে একটা ধ্রুবক-সংখ্যা সেঁটে দিলেন। এটি হলো মহাজাগতিক ধ্রুবক (Λ), যার কাজ হচ্ছে মহাকর্ষের আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখা যাতে করে গ্যালাক্সিগুলো এক জায়গায় চলে না আসে। ধ্রুবকটি স্থানকালকে বিপরীতে বাঁকিয়ে দেয়। কাজেই বস্তুরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। মহাজাগতিক ধ্রুবকের এই বিকর্ষী প্রভাব বস্তুদের ভেতরের আকর্ষী প্রভাবকে ভারসাম্যে আনতে পারে। এই ধ্রুবক ঢুকিয়ে দিয়ে একটি স্থির মহাবিশ্বের জন্য সমাধান পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু এটি ছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের সেরা ভুলগুলোর মধ্যে অন্যতম! (স্টিফেন হকিং, ২০০১)[*]

মহাবিস্ফোরণ এবং অতঃপর

The universe had a beginning

~ Alexander Vilenkin

যদিও আইনস্টাইন মহাবিশ্ব প্রসারণের ব্যাপারটি মানতে চাননি, কিন্তু পরে দেখা গেল বিশ্বজগৎ আসলেই ক্রম প্রসারমান। আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান আইনস্টাইনের সমীকরণ ব্যবহার করে তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে দেখান যে—মহাবিশ্ব আসলে স্থির নয় বরং প্রসারিত হওয়ার কথা। কয়েকবছর পর নামকরা পদার্থবিদ ও খ্রিস্টান যাজক জর্জ লেমেটার তাত্ত্বিকভাবে ও পর্যবেক্ষণ-সহ মত দেন ব্যাপারটা আসলে তাই। লেমেটার বললেন যেহেতু নক্ষত্রগুলো একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই অতীতে ফিরে গেলে একপর্যায়ে দেখা যাবে সমস্ত পদার্থ একত্রে ঘনীভূত অবস্থায় ছিল। অনেকটা 'মহাজাগতিক ডিম'-এর মতো। এর মানে হচ্ছে মহাবিশ্ব অনাদি কাল থেকেই অস্তিত্বে ছিল এমন কথা ভুল। একদা মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ছিল না, পরে অস্তিত্বে এসেছে সম্ভবত এক মহাগর্জনের মাধ্যমে!

লেমেটারের ব্যাখ্যা শুনে তখন অনেক বিজ্ঞানীই নাক সিঁটকালেন। তারা বললেন ধর্মীয় কারণে লেমেটার এই মত সাজিয়েছেন। কারণ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে আসে, যে জিনিস আগে ছিল না, কিন্তু পরে অস্তিত্বে এসেছে; এমন কিছুর অস্তিত্বের পিছে কোনো-না-কোনো কারণ তো থাকতে হবে। যেহেতু মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে অনস্তিত্ব থেকে, তাই এর পিছেও কোনো কারণ থাকার কথা। কিন্তু এই কারণ হতে হবে মহাবিশ্বের বাইরের কোনো কিছু। কারণ মহাগর্জনের পরেই স্থান-কাল-পদার্থ-সূত্র এদের উদ্ভব। তা হলে তো স্রষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে! (ইউজিন নাগাসাওয়া, ২০১১)[১] নাহ, এটা মানা যাচ্ছে না! কিছু বিজ্ঞানী চাইলেন না বিজ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার ইঙ্গিত আসুক। তাই সে সময়ের অন্যান্য পদার্থবিদেরা লেমেটারকে পাত্তা দিলেন না।

পরে লেমেটারের পক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ নিয়ে হাজির হন জ্যোতির্বিদ এডুইন পাওয়েল হাবল। তিনি মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালাক্সিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে গ্যালাক্সি-থেকে-আসা আলো বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। তুমি যদি দৃশ্যমান আলোর চার্ট খেয়াল করো তা হলে দেখবে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড়ো, নীল আলোরটা ছোট। কোনো গ্যালাক্সি যদি আমাদের কাছে আসতে থাকে তা হলে তা-থেকে-নিঃসৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হতে থাকবে, ফলে নীল

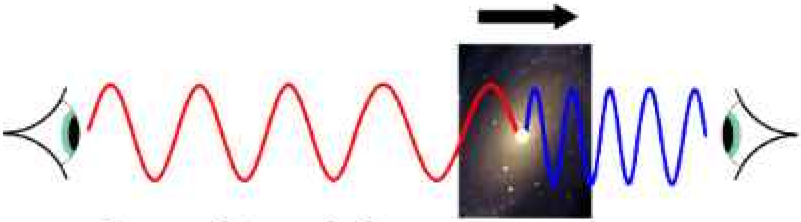

সহজ চিত্রে ডপলার শিফট। গ্যালাক্সি যদি তোমার থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে তার থেকে আসা আলো লাল হবে। গ্যালাক্সি তোমার দিকে আসতে থাকলে আলো হবে নীল। লালের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, নীলের কম।

আলোর দেখা মিলবে। একে বলা যেতে পারে ব্লু শিফট। অন্যদিকে গ্যালাক্সিটি যদি দূরে সরে যেতে থাকে তা হলে তা-থেকে-নিঃসৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দীর্ঘ হতে থাকবে; ফলে লাল আলোর দেখা মিলে। এটা হলো রেড শিফট। হাবল দেখলেন গ্যালাক্সির দূরত্ব যত বেশি তার বেগও তত বেশি। অর্থাৎ সব গ্যালাক্সি যেন একে অপর থেকে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে! তিনি হিসেব কষে গ্যালাক্সির এই গতির জন্য একটা সমীকরণও দাঁড় করিয়ে ফেললেন ($v=H_0d$)। যদিও হাবলের বেশ কয়েক বছর আগেই জর্জ লেমেটার এই সূত্রের ছক এঁকেছিলেন। (হেলগ ক্রাফ, ১৯৯৬)[১] আইনস্টাইন মহাবিশ্বের প্রসারণের ব্যাপারটি মানতে পারেননি। নিজ সমীকরণে একটি উটকো ধ্রুবক ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাপারটি থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রসারণের পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ মিলার পর তিনি মাথায় হাত দিলেন, পরে বলেছিলেন, *এটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল সিদ্ধান্ত !*

গ্যালাক্সিগুলোর একে-অপর থেকে দ্রুত দূরে সরে-যাওয়ার-বিষয়টি লেমেটারের সিদ্ধান্তের দিকে ইঙ্গিত দিতে থাকে—অতীতের কোনো ক্ষণে সবগুলো গ্যালাক্সি সম্ভবত এক বিন্দুতে ছিল! সেখান থেকে এই বিশ্বজগৎ প্রসারিত হতে শুরু করায় গ্যালাক্সিগুলো একে অন্য থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে; এবং এখনও সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বজগতকে যে অসীম ও শুরু-শেষহীন ভাবা হতো তা ঠিক নয়। বোঝা যাচ্ছে, এর শুরু আছে, এবং একসময় তাপমৃত্যুর মাধ্যমে এর শেষ হবে—এমনটাই গুঞ্জন উঠল।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের একাংশ মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব মানতে চাইলেন না। বিখ্যাত ফ্রেড হয়েল বিবিসি রেডিয়োর এক অনুষ্ঠানে তাচ্ছিল্য-করে এই তত্ত্বের নাম দিলেন 'বিগ ব্যাং'। কারণ সৃষ্টির সূচনায় এমন কোনো বিন্দু থাকলে সেখানে বিজ্ঞান অকার্যকর হয়ে পড়বে। ফলে মহাবিশ্ব কীভাবে শুরু হবে তা নির্ধারণের ভার ধর্ম আর স্রষ্টার হাতে চলে যাবে। (স্টিফেন হকিং, ২০১৩)[২] স্রষ্টায় অবিশ্বাসী পদার্থবিদেরা তাই এই তত্ত্বকে প্রবলভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা করলেন। হয়েল আরও দুজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে বিকল্প 'অটল মহাবিশ্ব মডেল' (Steady state theory) দাঁড় করালেন। তাদের প্রস্তাবিত মহাবিশ্বের কোনো শুরু নেই, কোনো মহাবিস্ফোরণ নেই। অপরদিকে দুজন

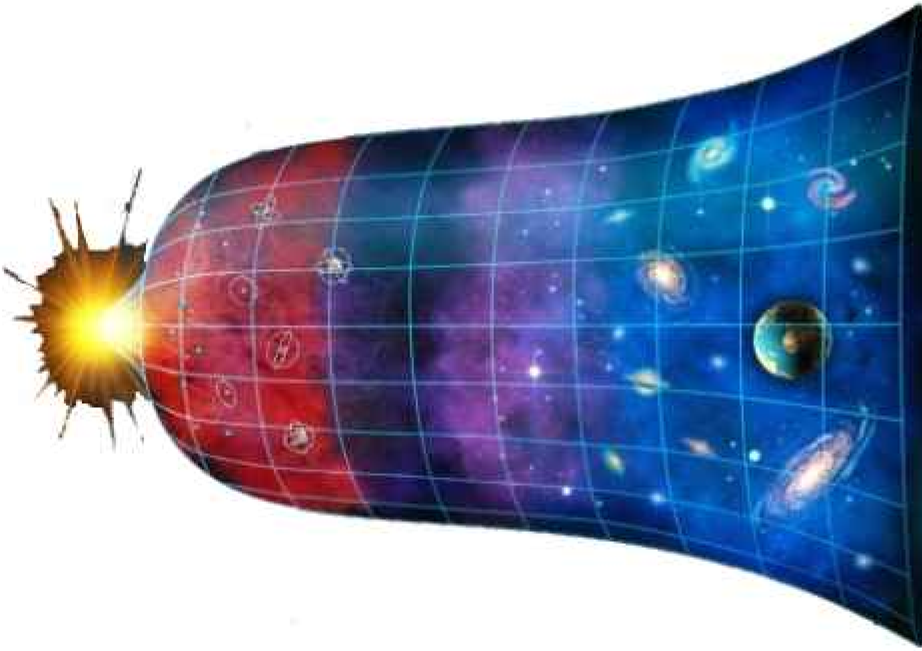

প্রচলিত ধারণায় প্রায় ১৪০০ কোটি বছর আগে মহাবিস্ফোরণের ফলে এক সিঙ্গুলারিটি থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। এই সিঙ্গুলারিটি আসলে কী, কোথেকেই-বা এলো—বিজ্ঞানীরা তা জানেন না। বিজ্ঞানীরা এই সিঙ্গুলারিটিকে 'নাথিংনেস' বলে থাকেন। কারণ তখন স্থান-কাল-পদার্থ-সূত্র কিছুই ছিল না। একজন পদার্থবিদের ভাষায়, *'আমাদের মহাবিশ্ব শুরুতে আসলে এই নাথিং-ই ছিল, এই সিঙ্গুলারিটি নামক নাথিং, যার ঘনত্ব ও তাপমাত্রা ছিল অসীম। কোথেকে এলো এটা, কেনই-বা এলো আমরা জানি না।'* (আহমেদ মোস্তফা কামাল, ২০১৯)[৩] সাধারণ মানুষ জানে না, এই সিঙ্গুলারিটি নামক 'নাথিং' যে আসলে 'সামথিং'। তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ তাদের প্রতারিত করার চেষ্টা করে। চটিস সাইজের বই লিখে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বলে— দেখো! একেবারে শূন্যতা থেকে আপনা-আপনি মহাবিশ্ব তৈরি হতে পারে! খোদার দরকার কী? পদার্থবিদ্যার সূত্র আছে না? এরাই যথেষ্ট! কিন্তু সেই সূত্র কীভাবে এলো, সিঙ্গুলারিটি কোথেকে এলো—এই প্রশ্ন তারা এড়িয়ে যায়। তাদের এমন ধোঁকাবাজির সমালোচনা করেছেন তাদের লোকরাই। (রাকান আহমেদ, ২০১৯)[৪]

মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্ব কীভাবে বিবর্তিত (পরিবর্তিত) হলো এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত ধারণা হলো ইনফ্লেশন তত্ত্ব। অনেকেই বিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মহাবিশ্ব বিকাশের এই ধারণাকে নিশ্চিত সত্য ভেবে বসে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ইনফ্লেশন তত্ত্ব অনেকেই মানতে চাইছেন না। একই উপাত্তের উপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় ১৩-১৪টি ভিন্নভিন্ন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন। উপাত্তের সীমাবদ্ধতা, বিকল্প তত্ত্ব সমস্যা ইত্যাদি কারণে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বই চূড়ান্ত নয়, বিজ্ঞানের কোনো ফ্যাক্টই নিশ্চয়তা দেয় না। বিজ্ঞানের ফ্যাক্ট আর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকে মানুষ এক ভেবে ভুল করে। সাধারণ মানুষকে এসব জানানো হয় না। ফলে তারা ভাবে বিজ্ঞান যা বলেছে তা মানে হয় চূড়ান্ত। (ছবি: নিউ অ্যাটলাস)

রুশ বিজ্ঞানী ভিন্ন প্রস্তাব দিলেন। এদের প্রস্তাবনা মার্ক্স-লেনিনবাদী দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের জন্য খুবই সুবিধাজনক হয়েছিল। কারণ, এতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি-সংক্রান্ত বিব্রতকর প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ব্যস, স্রষ্টাকে মানার ঝামেলা থেকে মুক্তি! তাই সোভিয়েত-বিজ্ঞানীদের কাছে সেই ধারণা খুব প্রিয় হয়ে উঠে। (স্টিফেন হকিং, ২০১৩) এসকল তত্ত্ব দ্রুতই হালে পানি পেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলো না।

হাবলের পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মহাজগতে হিলিয়ামের প্রাচুর্য ও আদিপটভূমির বিকিরণ (cosmic microwave background radiation) খুঁজে পাওয়া মহাগর্জন তত্ত্বকে শক্তিশালী করে তোলে। সব পর্যবেক্ষণ একাট্টা করে বিজ্ঞানীরা ছক সাজালেন—আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ১৪০০ কোটি (14 byr) বছর আগে এক অত্যন্ত ঘনীভূত ও উচ্চ তাপমাত্রার বিন্দু থেকে মহাবিস্ফোরণের ফলে ক্রমশ প্রসারণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে। বিশ্বজগতের ঠিক সূচনামুহূর্ত বা ঠিক তার পরের মুহূর্তগুলো বিজ্ঞানীরা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। অনুমান করা হয় বিশ্বজগৎ জন্মের পর মাত্র $১০^{-৩৩}$ সেকেন্ডের মাঝে সেই ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে অকল্পনীয়ভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। একে মহাজাগতিক স্ফিতি বা কসমিক ইনফ্লেশন (cosmic inflation) নাম দেওয়া হলো। বলা হয়—স্থানের এই অবিশ্বাস্য প্রসারণের গতি ছিল আলোর বেগের চেয়েও বেশি! এরপর আনুমানিক ১৪০০ কোটি বছর কেটে গেল। অবিশ্বাস্য প্রসারণটি গতি কমিয়ে দিল অনেক। এর মাঝে তৈরি হতে থাকল নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ।

ধারণা করা হয় এভাবেই আমাদের মহাবিশ্ব আজকের পর্যায়ে এসেছে। তোমরা অনেকেই এই গল্পের সাথে পরিচিত। তাই এই গল্প বেশি বাড়াতে চাই না। জনপ্রিয় বিজ্ঞান বইগুলোতে মহাবিশ্ব গঠনের এই গল্প তোমরা 'সত্য' বলে শুনে এসেছ। আমিও তা-ই ভাবতাম। কিন্তু বড়ো হওয়ার পর যখন পড়াশোনার দিগন্ত বিস্তৃত হলো তখন বেশ আশ্চর্য হয়ে পড়লাম। জানতে পারলাম একেবারে ফ্যাক্ট-ভেবে-বসে-থাকা মহাজাগতিক স্ফিতি তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা বেশ সংশয়ে আছেন। এই ইনফ্লেশন তত্ত্ব সাজানোর পিছে যারা ছিলেন তাদের মাঝে একজন এই তত্ত্ব থেকে সরে এসেছেন। (পল স্টেইনহার্ট, ২০১১)

ইনফ্লেশন তত্ত্ব প্রদানের পর বেশ কিছু ঝামেলা দেখা দিতে লাগল। তত্ত্ব অনুযায়ী সময়ের সাথে গ্যালাক্সির গতি কমে আসার কথা ছিল। অথচ কমার নামগন্ধও দেখা গেল না, বরং দেখা গেল গ্যালাক্সিগুলো একে-অন্য থেকে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে! অর্থাৎ নজরে-আসা পদার্থের তুলনায় প্রসারণগতি আরও শক্তিশালী প্রতীয়মান হলো। বিজ্ঞানীরা দেখলেন এই সমস্যা সমাধানে মহাকর্ষের ধারণা আবার বদলানো লাগছে দেখি! কিন্তু কিছুদিন পরপর

> সত্যি বলতে কী—মৌলিকভাবে মহাকর্ষ যে আসলে কী তা আমরা জানি না। আমরা খালি এর আচরণ বুঝতে পারি, এই যা।
>
> - নাসা
> স্টারচাইল্ড প্রোজেক্ট

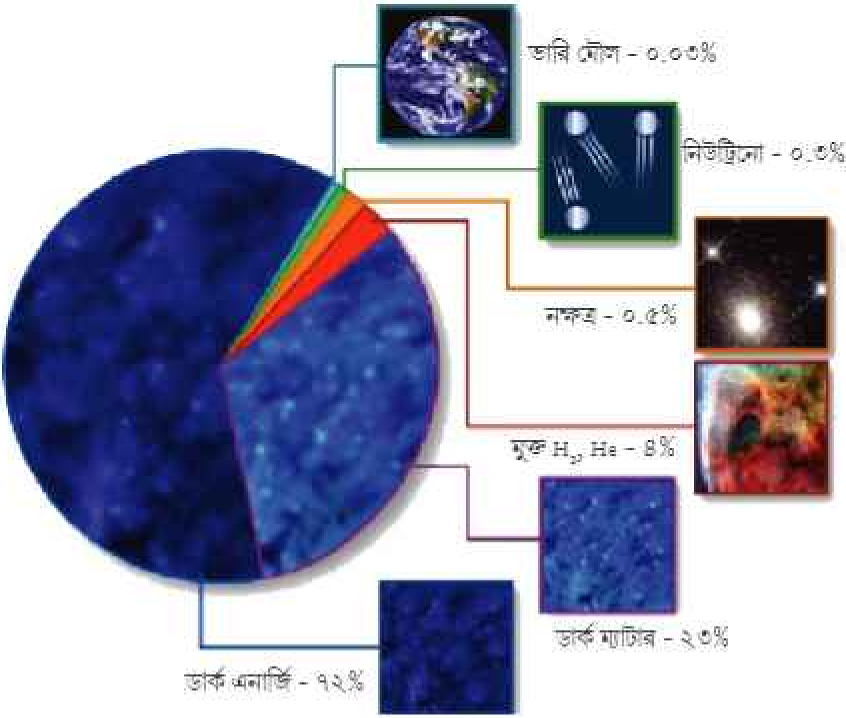

মহাবিশ্বের অনুমিত গঠন। প্রচলিত ব্যাখ্যা (Λ CDM) অনুযায়ী মহাবিশ্বের মাত্র ৪-৫% সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। বাকি ৯৫% অজানা রহস্যে ভরা। মানে অজ্ঞতায় ভরা আরকি। (মূলছবি : নাসা)

মহাকর্ষের ব্যাখ্যা বদলানো লাগলে বিপদ না! মানুষজন বলবে—কী বিজ্ঞান শেখাচ্ছ তোমরা? মহাকর্ষের স্বরূপটাই ধরতে পারছ না! তাই তারা সেটা না করে অজ্ঞাত-পদার্থ (Dark matter) ও অজ্ঞাত-শক্তি (Dark energy) নামের দুটি রহস্য তৈরি করে (ad hoc hypothesis) বর্তমানে প্রচলিত মহাকর্ষের ধারণাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। (ডেভিড মেরিট, ২০১৭)[৯] বলা হলো, এই অজ্ঞাত-পদার্থ ও অজ্ঞাত-শক্তি হচ্ছে মহাকাশবিদ্যার মিসিং লিংক! অজ্ঞাত-পদার্থ দৃশ্যমান পদার্থকে ধরে রাখে, আর অজ্ঞাত-শক্তি তাদের দূরে ঠেলে দিতে চায়। তা এই অনুমিত অজ্ঞাত জিনিস দিয়ে মহাবিশ্বের কত অংশ ভরপুর? প্রায় ৯৫% শতাংশই হলো অজ্ঞাত-পদার্থ ও অজ্ঞাত-শক্তি, যা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। কিচ্ছু না! বাকি ৪-৫% দৃশ্যমান অংশের কিছুটা আমরা জানি। এক মহাকাশবিদ আক্ষেপ করে বলেছেন, *'এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার যে এই মহাবিশ্বের মাত্র ৫% আমরা জানি।'* (পল্লব ঘোষ, ২০১৯)[১০]

প্রচলিত বইপত্রে বলা হয় এই ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি-র *'অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে'*। (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৮)[১১] অথচ বাস্তবতা হলো

এগুলো হলো স্রেফ সহযোগী অনুকল্প। একটা নতুন তত্ত্ব বানানোর চেয়ে আগের তত্ত্বে কোনো কিছুকে ঠেলে ঢোকানো সহজ। কেউই জানে না এগুলো আসলে কী! মজার ব্যাপার হলো, সাম্প্রতিক গবেষণা জানাচ্ছে এগুলোর অস্তিত্বের ধারণা আর যুক্তিসিদ্ধ মনে হচ্ছে না! (সাইন্সডেইলি, ২০১৭)[১২] তাই কেউ-কেউ মহাকর্ষের ধারণাকে ঘষামাজা করে ডার্ক ধারণার বিপক্ষে বলছেন। (জুরি শিরমত, ২০১৯)[১৩] শেষমেশ উপায় না দেখে ডার্ক এনার্জির খোঁজে প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন কিছু বিজ্ঞানী। আগামী ৫ বছর ধরে জটিল যন্ত্রপাতি (Dark Energy Spectroscopic Instrument) দিয়ে তারা অজ্ঞাতশক্তির খোঁজে মহাকাশ চষে বেড়াবেন। (পল্লব ঘোষ, ২০১৯)[১৫]

> আমাদের গবেষণা জানাচ্ছে—সুপারনোভা দিয়ে হিসেব-নিকেশ করে যে ডার্ক অ্যানার্জির ধারণা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা কিনা ২০১১-তে নোবেল পুরস্কারও জিতে নিয়েছে—তা একটি ভঙ্গুর ও ভুল অনুমানের-উপর-দাঁড়ানো।[১৪]
>
> - প্রফেসর ইয়াং-ওক লি
> মহাকাশতত্ত্ববিদ

মহাকাশের অধিবাসীদের গতিবিধি ব্যাখ্যার জন্য যে জেনারেল রিলেটিভিটির ব্যবহার করা হয় তাও কিন্তু ঝামেলামুক্ত না। এই তত্ত্বের একটি বুনিয়াদি অনুমান হলো ভ্যাকিউমে আলোর গতি পুরোপুরি ধ্রুবক। কিন্তু এই ধারণার বিপরীতে প্রমাণ পাওয়া গেছে। (স্টুয়ার্ট ক্লার্ক, ২০১৭)[১৬] তাছাড়া এই তত্ত্ব সবজায়গায় প্রয়োগও করা যায় না। (জেরেমি টেইল, ২০১৯)[১৭] ব্ল্যাকহোলে, মহাবিশ্বের সূচনা-মুহূর্তে, অতিআণবিক পর্যায়ে জেনারেল রিলেটিভিটির ধারণা কাজ করে না। এর কারণ হল, তত্ত্বটি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে খাপ খায় না। (স্টিফেন হকিং, ২০০১)[১৮] জেনারেল রিলেটিভিটি সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পুরো আড়াআড়ি ভাব! জগতের বর্ণনায় দুই তত্ত্ব দুই কথা বলে; একটি *ডিটারমিনিস্টিক*, আরেকটা *প্রোব্যাবিলিস্টিক*। আইনস্টাইন কখনোই কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সুনজরে দেখেননি।

এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝা কিন্তু বড্ড মুশকিল। জনপ্রিয় এক লেখকের কলমে জানা যায়, '*কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুবই রহস্যময় একটা বিষয়—এটা দিয়ে ব্যাখ্যা করার পর সাধারণত বিষয়টি আরও ভালো করে বোঝার পরিবর্তে মানুষজন আরও বিভ্রান্ত হয়ে যায়।*' (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৫)[১৯] সাধারণ মানুষ নয় শুধু, পদার্থবিদদেরও একই দশা! এক কোয়ান্টাম-মেকানিক্স বিশারদের ভাষ্যে (শন ক্যারল, ২০১৯)[২০]:

> আমার মতে কেউই কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝে না।
>
> - রিচার্ড ফাইনম্যান
> তাত্ত্বিক পদার্থবিদ

> **একজন আমজনতা হাতে-থাকা স্মার্টফোনের ভেতরে-চলা ক্রিয়াকলাপ যতটুকু বোঝে, পদার্থবিদদের কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝার অবস্থাও তেমন।**

এত অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের ব্যাপারে তোমরা জানো না।

মহাবিশ্বের যে শুরু আছে এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে জোরালো কোনো মতানৈক্য নেই। (লিসা গ্রসম্যান, ২০১২)[২০] কিন্তু এর পরে কীভাবে মহাবিশ্বের বিকাশ হলো তা নিয়ে বিতর্ক চলছে এখনও। এখন পর্যন্ত মহাবিশ্বের বিকাশ নিয়ে প্রায় ১২-১৩টি ভিন্ন-ভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে বিজ্ঞানীদের মাঝে! (একরেম এতিনার, ২০১৮)[২১] কিন্তু কেবল তোমরা একটা ব্যাখ্যাই জানো! কোনো সময়ে বিজ্ঞানের যে ব্যাখ্যা বহুল প্রচার পায় তার সাথে অনেক মানুষের ক্যারিয়ার জড়িয়ে থাকে। পুরোনো ধারণা বাদ দেওয়া এত সহজ না। তাই দেখা যায় যে-সকল উপাত্ত প্রচলিত ব্যাখ্যার সাথে মিলে না, সেগুলো বাদ দেওয়া হয় বা ব্যাখ্যার জালে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় (থিওরি লেডেননেস)। তা ছাড়া ভিন্ন ব্যাখ্যাগুলোকেও দমানোর চেষ্টা চলে প্রতিনিয়ত-এমনটাই জানিয়েছেন গবেষকরা। (হেলথ ফ্রাগ, ২০১৯)[২২]

সেক্যুলার সমাজ বিজ্ঞান-থেকে-আসা ধারণার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। আর এই জ্ঞান যদি নিজেই টালমাটাল হয় তা হলে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরা অবশ্যম্ভাবী। তাই বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস পাকাপোক্ত করতে হলে ভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতকে অগ্রাহ্য করা বা দমিয়ে রাখা দরকার পরে।

বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি, এত-এত আবিষ্কার; অথচ দেখো আমাদের জ্ঞান কতটা সীমিত! একজন বিজ্ঞান লেখকের ভাষায় বললে—মহাবিশ্বের বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্যালাক্সির মাঝে মাত্র একটি গ্যালাক্সি হলো আমাদের শুভ্রপথ, সেই গ্যালাক্সির অজস্র নক্ষত্রের মাঝে মাত্র একটি হলো সূর্য; সেই সূর্যকে-ঘিরে-চলতে-থাকা ছোট্ট একটি নীল গ্রহের নাম পৃথিবী। সেই পৃথিবীর বাসিন্দার মাঝে আমরা মানুষ; দেড় কেজি মস্তিষ্কের, বুদ্ধি-বিবেক-চিন্তাশক্তি-সম্পন্ন প্রাণি।

কিন্তু তিনি এটা বলেন না যে—বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও, মানব-সভ্যতার এত কাল পার হওয়ার পরও এই মহাবিশ্বের ৪-৫% এর কিছু অংশ আমরা জানতে পেরেছি! যতটুকু জেনেছি সেটা নিয়েও আমরা নিশ্চিত না! কখনও নিশ্চিত হতে পারব ও না! (জন বাওকার, ২০১৪)[২৩]

> **বিশ্ব পরিচালিত হয় যে-সমস্ত মৌলিক গাণিতিক সূত্রে, সেগুলো নিয়েই পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহের নকশা তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে-সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে তা চূড়ান্ত নয়। এবং প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের স্বরূপ কী তা কোনো বিজ্ঞানীই চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে আমাদেরকে বলতে পারবেন না।**

এরপরও আমরা বিজ্ঞানের অহংকার করি।

কী আশ্চর্য!